দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা : রোববার, ৮ই কার্তিক, ১৩৯৩

# প্রাথমিক শিক্ষা বনাম দারিদ্র্য

বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের মিঃ ম্যাগনাস হাকানসন্স প্রণীত সংক্ষিপ্ত শিক্ষা রিপোর্ট ১৯৮৬ সহ বিভিন্ন সমীক্ষা ও মূল্যায়ন রিপোর্টে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটা চিত্র পাওয়া যায়। চিত্রটি এক কথায় নৈরাজ্য-জনক। এতে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায় শতকরা ৬৭ ভাগ ছাত্র শিক্ষাঙ্গন থেকে চলে যায়।

এ সব রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাঙ্গন ত্যাগের ছাত্রসংখ্যার এই পরিস্থিতি গত যুগ অর্থাৎ ১৯৭৫-৮৫ থেকে সামান্য উন্নতি দেখা দিলেও এই যুগে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ কমেছে।

সবচেয়ে হতাশাজনক চিত্র হল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকেই বেশীর ভাগ ছাত্র লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে।

গত বুধবার ৫ দিনব্যাপী ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার উপর এক জাতীয় সেমিনার সমাপ্ত হয়েছে।

এ সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকগণ রয়েছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি যে প্রতিকূল একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-দের অর্ধাংশেরও বেশী প্রথম বর্ষ থেকে শুরু করে শেষ স্তর অর্থাৎ ৫ম বর্ষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিদায়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে এটা নতুন নয়। এবারের রিপোর্টে যে কথাটা বেরিয়ে আসছে তা হল এই যে, প্রথম বর্ষেই স্কুল থেকে ছাত্রদের চলে যাওয়ার সংখ্যাটা বেশী। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যে কথাটা বলেছেন সে কথা আমরা সবাই অল্পবিস্তর জানি।

এর প্রধান কারণ হল দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের ছাত্ররা স্কুল ছাড়ছে সংসারের আয় বৃদ্ধিতে নিজেদের শ্রম দেয়ার জন্য। স্কুলে কোন অর্থ ব্যয় করতে না হলেও সংসারের যে শিশু শিক্ষার জন্য স্কুলে সময় ব্যয় করে তার শ্রম যা সংসারের আয়ের ক্ষেত্রে যে সামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হোক না কেন, তার ক্ষতিটুকু সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। শিশুটি যদি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করে তবে পরিবারকে অতি-রিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। একজন লোক--যাদের গ্রাম্য ভাষায় 'মুনীষ' বলা হয়, তাকে দিয়ে ক্ষেতখামারে কাজ করানোর জন্য তা সংকুলানের সামর্থ্য তাদের নেই।

একজন শিশুর শিক্ষাঙ্গন ত্যাগের এটাই প্রধান ও প্রথম কারণ। এ অবস্থাটা আজকের নয়। পার্থক্য এই যে, যতই দিন যাচ্ছে গ্রাম্য কৃষক পরিবারগুলো দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। স্কুলে ছেলেমেয়ে-দের পাঠিয়ে অক্ষর পরিচয় করানোর মত সামান্য ইচ্ছাটাও তাদের কাছে বিলাসিতা মনে হয়। অর্থ-নৈতিক কারণে এই 'বিলাসিতাটুকু' তাদের সাধ্যা-তীত।

শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য তাদের কাছে অর্থহীন। এমনকি তার অর্থকরী ভবিষ্যতের জন্য চরম দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবার অপেক্ষা করতে পারে না। তাদের আজকের দিনটির আহার সংস্থানের কথা সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হয়। আর এই শিক্ষালাভ তাকে পর-বর্তী সময়ে কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এনে দেবে এমন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই সেখানে তাকে ক্ষেত-খামারের কাজে লাগিয়ে দেয়ার কথাটাই বাপ-মাকে ভাবতে হয় এবং এটা দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে ভবঘুরে লোকের তৃণখণ্ড ধরে ভাসবার ব্যবস্থার মতো মনে হলেও সেই আশাটুকু ও সম্ভাবনা খোয়াতে তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ভরসা পায় না।

এই নির্মম সত্য এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায় এবং গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে আকৃষ্ট করা যায় তা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের উৎকণ্ঠার অভাব নেই।

তারা একথাও বলেছেন যে, শিক্ষাদান পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয় এবং শিশুদের নিকট শিক্ষাকে আক-র্ষণীয় করে তোলারও অভাব আছে। উপস্থিত পেটের ক্ষুধা মিটানোর ব্যবস্থা ব্যতীত শিশুদের নিকট শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যে-কোন পদক্ষেপই নেয়া হোক তা শিশুদের শিক্ষাঙ্গন ত্যাগে ভিড় কমাতে পারে না, এটা উপলব্ধির জন্য বিশেষজ্ঞদের নিকট যেতে হয় না। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণ যাই হোক তা স্কুল ঘর, স্কুলের অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষকদের বেতনখাতেই চলে যায়। একটা অংশ যায় বিনামূল্যে বইয়ের জন্য। কিন্তু এছাড়া স্লেট-পেন্সিল, খাতা কেনার জন্যও পয়সা দরকার। যে পরিবার তার শিশুশ্রমের আয়কে নিজেদের সামান্য আয়ের সঙ্গে যুক্ত করে কোনমতে জীবনধারণ করতে চায়, তার পক্ষে খাতা-পেন্সিলের জন্য বাড়তি ব্যয় করার কথা কোন যুক্তিতেই আসতে পারে না।

সামান্য একটি গামছা পরে পরিবারের শিশুটি মাঠে কাজ করতে পারে, কিন্তু স্কুলে তার প্যান্ট-জামা চাই। একেবারে উদোম হয়ে ক্লাস করা তো অসম্ভব। একথাটা বাইরের অর্থাৎ বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ না জানলেও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ভালভাবেই জানা আছে। তারা গ্রামের অবস্থার সঙ্গে ভাল-ভাবেই পরিচিত।

কাজেই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে অধিকতর মহিলা শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি আকর্ষণীয় করার জন্য সেমিনারের মূল্যবান অভিমত পরিস্থিতির উন্নতি কোথাও কোথাও করতে হয়তো পারবে। কিন্তু মূল সমস্যা ক্ষুধার্ত থেকে ক্লাস করার অবস্থাটা কীভাবে ফেরানো যায় সে কথাও ভাবতে হবে। গ্রামের গরীব কৃষক পরিবার যাদের মধ্যে ক্ষেতমজুর অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেয়া শিশুদের হারের চেয়ে কম হবে না, তাদের অবস্থা ফেরানোর সাথে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যুক্ত একথাটাও শিক্ষার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে রাখতে হবে।

গ্রামের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী সে কথাটা তো প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার ওপর সেমিনারেই উঠে এসেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ব্যাপক হারে ছাত্রদের চলে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে যেয়ে এই সমস্যাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

এযাবৎ দেশবাসী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে গ্রামের উন্নতির কথা শুনে আসছে। তার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষার মূল্যায়নে যে আর্থিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার কোন মিল নেই। সমীক্ষা-লব্ধ এই তথ্যটা সেদিক থেকেও মূল্যবান।

কথায় নয় কাজে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা একটা স্তর পর্যন্ত না পৌঁছলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য গৃহীত প্ল্যান-প্রোগ্রাম মৌলিকভাবে শিক্ষার অগ্রগতিতে কোন অবদান রাখতে পারে না। কোনরূপ তর্কবিতর্কে না গিয়েও এই সহজ যুক্তির কথাটা যদি আমরা সকলে মেনে নেই এবং সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোন পন্থা গ্রহণ না করেন, তবে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণের বুলি শুনিয়ে গ্রামবাংলা থেকে অশিক্ষার অন্ধকারের কালিমা মুছে দেয়া সম্ভব হবে না।

সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার রিপোর্টে আমাদের প্রথম করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলেও তারা ইঙ্গিত করেছেন যে, দারিদ্র্যই শিক্ষা বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।